অন্ধ সরকার অন্ধ মানবতা

ক্ষমতায় থাকলে সবার কি যেন একটা হয়। সহজ বিষয় সহজে বুঝতে পারে না। সব কিছুর মধ্যে জটিলতার গন্ধ খুঁজে পায়। দেশের প্রতিটি মানুষই যেখানে বুঝছে- নষ্টের মূলে ভিসি; সেখানেও সরকার নীরব। সরব সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনে। ডেকে আনছে নিজের পতনকে। আন্দোলনের ক্ষেত্র ঢা.বি. ক্যাম্পাসে শুরু হলেও সরকারের এমন অন্ধত্বের জন্য আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে সব ক্ষেত্রে ...

লিখেছেন গোলাম মোর্তোজা

খালেদার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ভিসি

একটি মিথ্যা বারবার প্রচারিত হলে মানুষ সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ড. জোসেফ গোয়েবলস। হিটলারের অনুসারী গোয়েবলস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিথ্যাকে সত্য বানানোর এই কৌশল প্রয়োগ করেন। তখন থেকেই মিথ্যা প্রচার গোয়েবলসীয় প্রচার হিসেবে পরিচিতি পায়। গোয়েবলস তার এই কৌশলে সাময়িক সুবিধা পেয়েছিলেন। তিনি কখনো অনুকরণীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি। স্থায়ীভাবে ইতিহাস তাকে চিহ্নিত করেছে মিথ্যাবাদী হিসেবেই। মানুষ তাকে সম্মান করে না, দেখে অসম্মানের প্রতীক হিসেবে। তবে গোয়েবলসের অনুসারী বর্তমান যুগেও যে দু'একজন নেই, তা নয়। এখনো কিছু মানুষ আছেন, যারা গোয়েবলসকে অনুকরণীয়-অনুসরণীয় হিসেবে মেনে চলছেন। এরকমই একজন মানুষের নাম ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। ড. জোসেফ গোয়েবলস ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। আর ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি। দু'জনের নামের আগে 'ডক্টর' শব্দটি ছাড়া আর কিছুতে মিল না থাকলেও দু'জনের চরিত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী গোয়েবলসকে অনুসরণ করছেন চমৎকারভাবে। ড. চৌধুরীর অনেক রকমের গুণের সঙ্গে মানুষ ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলো। ২৪ জুলাই থেকে মানুষ দেখছে তার গোয়েবলসীয় গুণটি।

২৪ জুলাই রাত তিনটায় পুরুষ পুলিশ শামসুন্নাহার হলে ঢুকে নারকীয় তাণ্ডব চালানোর ঘটনা এখন সবারই জানা। জানেন না শুধু ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। তার দাবি তাই প্রমাণ করে। অথচ তারই জানার কথা ছিলো সবার আগে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় ১৪শ' শিক্ষকের অভিভাবক তিনি। অবশ্য অভিভাবক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন অসংখ্য মিথ্যার জন্ম দিয়ে। আবার কোনো মিথ্যাকেই তিনি ধারণ করে থাকতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তেই তার মুখ থেকে জন্ম নিচ্ছে নিত্য নতুন মিথ্যার। হলে পুলিশ প্রবেশ প্রসঙ্গে পরপর তিন দিন তিনি দিয়েছেন তিন ধরনের বক্তব্য।

২৪ জুলাই ভিসি বলেছেন, 'রাত তিনটায় হলে মহিলা পুলিশ ঢুকেছে। কোনো পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি।'

২৫ জুলাই বলেছেন, '৩৫ থেকে ৩৭ জন মহিলা পুলিশ হলে ঢুকেছিল। তবে তাদের সঙ্গে তিনজন পুরুষ কমান্ডিং অফিসার ছিল।'

২৬ জুলাই বলেছেন, 'রাত তিনটায় নয়, পুলিশ হলে ঢুকেছে রাত আটটায়। কোনো পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি।'

২৩ জুলাই বিকেল থেকেই শামসুন্নাহার হল ছিল অশান্ত। হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন হলের সামনে। রাত আটটার দিকে মহিলা পুলিশ হলের ভেতরে ঢুকেছে– সেটাও দেখেছেন উপস্থিত সবাই। রাত তিনটায় যখন গেট ভেঙে শতাধিক পুরুষ পুলিশ হলের ভেতরে প্রবেশ করে, সেটাও দেখেছেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সাংবাদিকরা। রাত তিনটার এ দৃশ্য ভিসি দেখেননি। তার দেখার কথাও নয়। কারণ তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। দেখেননি বলে কী জানা সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভিসির জানার কথা। এ ঘটনাও নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। তারপরও ভিসি কেন বলছেন, কোনো পুরুষ পুলিশ হলের ভেতরে প্রবেশ করেনি? রহস্যটা এখানেই। ড. চৌধুরী সরকারের প্রচার বা তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নন, যেমনটা ছিলেন গোয়েবলস। তবে বাস্তবতা হলো, মন্ত্রী না হলেও তিনি সরকারেরই লোক। দলীয় পরিচয়ের কারণেই হঠাৎ করে তিনি উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাই ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী দলের পক্ষে, সরকারের পক্ষে কাজ করছেন, করার চেষ্টা করছেন। সরকারের পক্ষ নিয়ে তিনি তুষ্ট করতে থাকেন ছাত্রদলের নেত্রীদের। যারা আবার বিভিন্ন অপকর্মের নিয়ন্ত্রক। এদের শেল্টার দেয়া নিয়ে বিপত্তি বাধলেই ভিসি আনোয়ার শুরু করেন গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার। কিন্তু এরই মধ্যে তার নিজের গ্রহণযোগ্যতা নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায়। এই একটিমাত্র লোকের কারণে বিএনপি সরকার সবচেয়ে বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে আন্দোলনের ক্ষেত্র শুধু ঢাবি ক্যাম্পাস মনে হলেও প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের মধ্যে দেখা গেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। কেননা তারা বুঝতে পারে বাংলাদেশের পুলিশ ছাত্রী হলে ঢুকলে কী করতে পারে, তাও আবার রাত তিনটায়!

টিএসসি'র সামনে সহপাঠীদের ওপর পুলিশী এ্যাকশন দেখছে ছাত্ররা

ব্রিটিশ লেখক মেরি শেলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখেছেন উপন্যাস 'ড. ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। উপন্যাসের নায়কের নাম ছিল ড. ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। গবেষণার মাধ্যমে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মানবরূপী এক দানব সৃষ্টি করেন। এক পর্যায়ে সেই দানবই তাকে হত্যা করে। তখন থেকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'যে স্বীয় স্রষ্টার চরম বিপদ ঘটায়'।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর স্রষ্টার নাম খালেদা জিয়া। রাতের অন্ধকারেই খালেদা জিয়া তাকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আজ তার কর্মকাণ্ডের কারণেই চরম বিপদের মুখে খালেদা জিয়া, জোট সরকার। ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এখন খালেদা জিয়ার জন্য হয়ে উঠেছেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবরূপে। উপন্যাসের চরিত্রের মতো দানব তার স্রষ্টাকে হত্যা করবে, না স্রষ্টা ধ্বংসের আগেই দানবকে দমন করবো সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এই রিপোর্ট যখন লিখছি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র। পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করছে শিক্ষক-সাংবাদিক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। শুধু পুলিশ নয়, পিটিয়েছে খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেরাও। যারা পরিচিত ছাত্রদলের ক্যাডার নামে। একদল ছাত্র-ছাত্রী পুলিশের তাড়া খেয়ে, কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্রণা সইতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে উঠলো আইবিএ ভবনে। মধুর ক্যান্টিনে বসা ছিলো খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেরা। তারাও এগিয়ে গেল আইবিএ ভবনের দিকে। লাথি মেরে দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে ক্যাডাররা, ভেতরে বিশ-পঁচিশ জন অসহায় ছাত্র-ছাত্রী। তারা গত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছে শামসুন্নাহার হলে নির্যাতনের প্রতিবাদে। তাদের শিক্ষা দিতে চায় ছাত্রদল ক্যাডাররা। আইবিএ ভবনের এই দৃশ্যের কথা একজন এসে জানালেন মধুর ক্যান্টিনে বসা ছাত্রদল নেতা মনির হোসেনকে। তিনি এগিয়ে গেলেন। এ যাত্রায় কোনোক্রমে বেঁচে গেলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। অবশ্য মনির হোসেনের সামনেই কয়েকজন ক্যাডারদের লাথি-ঘুষি খেলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকরা প্রতিদিনই যা ঘটছে তাই লিখছেন। সত্য লিখছেন। এটা মোটেই পছন্দ নয় আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর। তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন তার গোয়েবলসীয় নীতি যেন সাংবাদিকরাও অনুসরণ করে। কিন্তু সাংবাদিকরা মোটেই তার কথায় কান দেয়নি। ভিসি যা করার তাই করেছেন। তার পুলিশ অবাধ্য সাংবাদিকদের পিটিয়েছে নির্দয়ভাবে। ফেলে রেখেছে ডাসের সামনে।

এ দু'টি ঘটনা আজ, ২৯ জুলাই, সোমবারের সারা দিনের ঘটনার খন্ডচিত্র। এরকম ঘটনা ঘটেছে আরো অনেকগুলো। ভিসি ড. আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী অসীম ক্ষমতাবান। প্রথম দিন শাসসুন্নাহার হলের ঘটনাই তার প্রমাণ দেয়। কিন্তু তাতেও কেউ কেউ তার ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারছিলেন না। আন্দাজ করতে পারছিলেন। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান আবার নিজের নামে কলাম লিখে ভিসির ক্ষমতা

বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভিসির কী এতো ক্ষমতা!' সাংবাদিক-সম্পাদকরা কী বোকার স্বর্গেই না বাস করেন! ভিসির দাপট সম্পর্কে তারা জানেন না, বিস্মিত হন। বিস্ময়ের জবাব ভিসি দিয়েছেন। প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার সম্রাটকে পিটিয়ে আধমরা করার ব্যবস্থা করেছেন। মতিউর রহমান এবার হয়তো ভিসির ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। মতিউর রহমানের সৌভাগ্য যে, তিনি ভিসির পুলিশের সামনে পড়েননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে বৈধ ছাত্রীরা থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু নিয়মের বাইরেও তো নিয়ম থাকে। থাকে 'বিশেষ' বলে কিছু বিষয়। শামসুন্নাহার হলের ২৩৫ নং এমন একটি রুম। এই হলে থাকে চার পাঁচজন মেয়ে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হয়ে গেছেন। কারো ছয় মাস, কারো এক-দেড় বছর আগে মাস্টার্সের রেজাল্ট হয়ে গেছে। তারপরও তারা হলে থাকে কী করে? শুধু থাকে না, তারাই হল পরিচালনা করে। তাদেন নাম লুসি, শান্তা, মেরিনা...। লুসি শামসুন্নাহার হল ছাত্রদল সভাপতি শান্তা সাধারণ সম্পাদক। হল প্রভোস্ট নয়, তারাই হলের সিট বরাদ্দ দেয়। টিভিতে সেই চ্যানেলই চলবে, যে চ্যানেল তারা দেখতে চায়। রাত নয়টার মধ্যে হলের গেট বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েদের এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই হলে ফিরতে হবে। কিন্তু তারা হলে ফেরে রাত বারোটা, একটায়। তাদের জন্য অনিয়মই নিয়ম। রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী সবার সঙ্গে তাদের ভালো সম্পর্ক। তাদের দাপটে হলের ছাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। তাদের এই কর্মকান্ডকে সমর্থন করছিলেন না প্রভোস্ট সুলতানা শফি। তাদের ইঙ্গিতেই সুলতানা শফিকে অব্যাহতি দেয়া হয় দায়িত্ব থেকে। এর প্রতিবাদ করে ছাত্রীরা। ছাত্রীদের হুমকি দিতে থাকে ২৩৫ নং রুমে অবস্থানকারী অছাত্রীরা। এক পর্যায়ে সাধারণ ছাত্রীরা ২৩৫ নং রুমে তালা দিয়ে দেয়। রুমে আটকা পড়েন অছাত্রী লুসি, শান্তা, মেরিনা প্রমুখ। লুসির খুব কাছের মানুষ একজন প্রতিমন্ত্রী। মোবাইলে যোগাযোগ হয় লুসির সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর। গেট ভেঙে ঢুকে যায় পুলিশ। পুলিশ হলে ঢুকে কী করেছে? বাংলাদেশের পুলিশ হলে ঢুকে যা করতে পারে তাই করেছে। নির্যাতন করেছে। একটি মেয়েকে যতভাবে নির্যাতন করা যায় ততভাবে। কথা হলো একজন নির্যাতিত মেয়ের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পুলিশ আমাদের ধর্ষণ যে করেনি সেটা বলতে পারছি না। কারণ মেয়েদের শরীরে হাত দিয়ে পুলিশ যা ইচ্ছে তাই করেছে। এরই নাম প্রাচ্যের অক্সফোর্ড! আমি কী পুলিশের হাতে সম্মান হারানোর জন্যে ভর্তি হয়েছিলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে?' কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর? উত্তর কী আছে কারো কাছে?

ছাত্রিত্ব শেষ হয়ে গেলেও লুসি ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর বিশেষ পরিচিত। ভিসির বাড়িতে সবাই যেখানে বসে থাকে, ২৪ জুলাই তাকে সেদিন সেখানে পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। লুসির সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ হয় আমাদের।

আপনি ছাত্রী না হয়েও হলে থাকেন কেন?

'আমি হলে থাকি না।'

কিন্তু শামসুল নাহার হলের সবছাত্রী এবং কর্মচারীরাও বলছে আপনারা হলে থাকেন।

বাথরুম প্রিয় ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে ২৮ ও ২৯ জুলাই দু'বার টেলিফোনে কথা হয়। দু'বারই কথা হয় খুব অল্প সময়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কেমন?

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : ভালো। বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছে। তারা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

২০০০ : আপনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের হল ছেড়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু আপনার কথায় ছাত্র-ছাত্রীরা হল ছেড়ে যায়নি।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : এ কথা তো সত্যি যে, এখন আর আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে সব কিছু নেই।

২০০০ : আপনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান সেই প্রতিষ্ঠানের সব কিছু যদি আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে পদ ধরে রাখার যৌক্তিকতা কী?

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : নিয়ন্ত্রণ থাকবে না কেন? আমি বলছি বহিরাগতদের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।

২০০০ : নিয়ন্ত্রণ নেই সেটা আপনিই বলছেন।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : ছাত্র-ছাত্রীরা তো আন্দোলন করছে না। তাদের ওপর তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ আছে।

২০০০ : আন্দোলন করছে বহিরাগতরা- এটা কী সত্য কথা।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই সত্যি।

২০০০ : আপনি শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। আপনার কাছ থেকে মানুষ সত্য কথা জানতে চায়। অসত্য বা বিভ্রান্তিকর কিছু শুনতে চায় না।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : আমি তো যা সত্যি তাই বলছি।

২০০০ : ক্যাম্পাসের প্রতিটি প্রবেশ মুখে পুলিশ। শিক্ষক, সাংবাদিকদেরও ঢুকতে হচ্ছে কার্ড দেখিয়ে। বহিরাগতরা এলো কীভাবে?

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে তো আর দেয়াল নেই। অনেক পথ দিয়েই বহিরাগতরা এসেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরাও ছাত্র-ছাত্রী পরিচয়ে আন্দোলন করছে।

২০০০ : আপনি কী মনে করেন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন?

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : প্রশ্নই আসে না। আমি ব্যর্থ হবো কেন? আমি মনে করি না এই ঘটনার সঙ্গে ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক আছে।

২০০০ : আপনি কী পদত্যাগের কথা ভাবছেন না?

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : পদত্যাগের প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : পরিস্থিতি আর কতোটা খারাপ হলে পদত্যাগের প্রশ্ন আসবে বলে আপনি মনে করেন?

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : আমি কেন পদত্যাগ করবো! আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না।

উত্তেজিত হয়ে ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী টেলিফোন রেখে দিলেন। এরপর কমপক্ষে চল্লিশবার তাকে ফোন করেছি। প্রতিবারই ওপাশ থেকে বলা হয়েছে ভিসি বাথরুমে আছেন। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত সব সময়ই তিনি বাথরুমে থাকেন। বোঝা যায় বাথরুম ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর খুবই প্রিয়। এই প্রিয়স্থানে দিনের অধিকাংশ সময় কাটানোর কারণেই হয়তো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ দিতে পারছেন না।

গভীর রাতে হলে ফেরেন।

'তারা সব আওয়ামী লীগের দালাল। আমি হলেই থাকি না, গভীর রাতে হলে ফিরবো কী ভাবে?'

তাহলে সেদিন হলে গিয়েছিলেন কেন?

'আমি হল শাখার ছাত্রদল সভাপতি। আওয়ামী লীগের দালাল প্রভোস্ট সুলতানা শফি এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হলের চৌদ্দজন হাউজ টিউটরের ওপর নির্যাতন করছিলো। এ কারণেই আমি হলে গেছি।'

আপনার কথা যদি সত্যি ধরে নেই তারপরেও প্রশ্ন থাকে। আপনি হলে গেলেন কেন?

'আমাকে হাউজ টিউটররা ডেকেছিলো।'

শিক্ষকরা আপনাকে ডেকেছিলো?

'হ্যাঁ আমাকে ডেকেছিলো। তারা বলেছিলো সুলতানা শফির হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

আপনার সঙ্গে একজন প্রতিমন্ত্রীর খুব ভালো সম্পর্ক। তাকে আপনি ফোন করার পরই হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছিলো?

'আমার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর ভালো সম্পর্ক– একথা ঠিক নয়। আর আমার ফোনেও পুলিশ হলে ঢোকেনি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরাও আপনাকে হলে দেখেছে?

'সাংবাদিকরা তো সত্য লিখছেন না। তারা সবাই হলুদ সাংবাদিকতা করছে। দেশের মানুষ পত্রিকার সংবাদের ওপর নির্ভর করতে পারছে না।'

আপনি সচিবালয়ের বিভিন্ন রকমের তদবিরের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ আছে?

'আমি কোনো দিন সচিবালয়ে যাইনি।'

কিন্তু আপনাকে অনেকেই নিয়মিত সচিবালয়ে দেখে।

'আওয়ামী লীগের দালালরা হয়তো দেখে।'

লুসি, শান্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তারা বিভিন্ন রকমের তদবিরের সঙ্গে জড়িত। সচিবালয়ে প্রায় নিয়মিত তাদের আনাগোনা। নিজেরা ছাড়াও আরও কিছু মেয়ে সব সময় তাদের সঙ্গে থাকে। ব্যবহৃত হয় তদবিরের কাজে। জানা গেছে, ঘটনার রাতে লুসি মহিলা ক্যাডার নামে তিনটি মেয়েকে হলে নিয়ে আসে। এদের একজন বরিশাল বিএল কলেজের নেত্রী। বরিশালের এই নেত্রীর নাম পাপড়ী। অন্য দু'জন হলো নিলুফার চৌধুরী ও অপরজন নয়ন। ঘটনার রাতে একটি মেয়ে তার নিজস্ব ক্যামেরায় ছবিও তোলে। পুলিশ মেয়েটির কাছ থেকে ক্যামেরা ও ফিল্ম কেড়ে নিয়েছে বলে দু'জন ছাত্রী অভিযোগ করেন।

ছাত্ররাজনীতির অবদান সমাজের এই লুসিরা। তারা নেত্রী, তাই তারা যে কোনো কিছু করতে পারে। শিক্ষকরা নীল-সাদা-গোলাপি রঙে বিভক্ত। '৭৩-এর

হাত জোড় করেও ক্ষমা পায়নি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীরা

অধ্যাদেশ তাদের এই রঙ লাগানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তারা দলাদলি করে নির্বাচন করেন। ছাত্রদের দলাদলি করতে বাধ্য করেন। এক গ্রুপকে আরেক গ্রুপের বিপক্ষে কাজে লাগান। সন্ত্রাস করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ক্যাডারদের শেল্টার দেন। অথচ সব সময়ই দায় পড়ে ছাত্ররাজনীতির ওপর। কথা ওঠে বন্ধ করে দিতে হবে এই ছাত্ররাজনীতি। একথাও ঠিক যে, বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য আছে একথা সত্যি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে টেণ্ডারবাজি, মাস্তানি আর সন্ত্রাসের নাম ছাত্ররাজনীতি হতে পারে না। এই ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন নেই। অনেকে বলবেন ছাত্ররাজনীতি নয়, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি বন্ধ করতে হবে। বাস্তবতা হলো ছাত্ররাজনীতি অব্যাহত রেখে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা যাবে না। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই যে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে যাবে এটাও সত্যি নয়। তবে ছাত্ররাজনীতি না থাকলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা হলে শেল্টার পাবে না। সমাজ থেকে না হলেও শিক্ষাঙ্গন থেকে হয়তো সন্ত্রাস কমে যাবে। তাই সাময়িক সময়ের জন্য হলেও ছাত্ররাজনীতি এখন বন্ধ করা প্রয়োজন। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের কথা বলে আসছেন। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত রেখেছেন। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন তিনি হয়তো আন্তরিকভাবেই শিক্ষাঙ্গনকে রক্ষা করতে চাইছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি বলেছেন, সমঝোতা হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হবে। সমঝোতা যে হবে না সেটা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে খালেদা জিয়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে চান না। ছাত্ররাজনীতি নিয়ে রাজনীতি করতে চান। খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে রাখলেও ছাত্রদল ক্যাডারা এখনো সক্রিয়। প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে তারা সন্ত্রাস করছে। কাজেই খালেদা জিয়ার কথা ও কাজে মিল নেই মোটেই। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হয়ে গেলে জাতির বিপদের সময়ে আন্দোলন গড়ে উঠবে না– এরকম যুক্তির কথা অনেকেই বলেন। কিন্তু এই যুক্তিটি একেবারেই ঠিক নয়। গত তিন-চার বছরের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে, ছাত্রসমাজের পক্ষে কোনো ছাত্র সংগঠন কোনো ভূমিকা রাখেনি। একদল অপেক্ষায় থাকে আপা কী বলেন আর অন্যপক্ষ ম্যাডামের মুখ চেয়ে বসে থাকে। এদের কোনো মেরুদন্ড নেই। অন্তত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায়ও ছাত্র সংগঠনগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। বিশেষ করে ছাত্রলীগের কোনো কার্যক্রমই ছিলো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংকটকালে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাই আন্দোলন করেছে। একথা সত্যি, বাম সংগঠনগুলো নেপথ্যে থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। তবে তারা এটা না করলেও এই আন্দোলন হতোই। কারণ মানুষ যখন বুঝতে পারে নিজের ওপর আক্রমণ হয়েছে, তখন সে রুখে দাঁড়ায়। সংগঠন না থাকলেও সংগঠিত হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে। তবে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শিক্ষক রাজনীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের গায়ের এই নীল-সাদা-গোলাপি রঙ মুছে ফেলতে না পারলে ছাত্ররা তাদের শ্রদ্ধা করবে না। শিক্ষকদের জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। '৭৩-এর অধ্যাদেশ তাদেরকে স্বেচ্ছাচারী করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ক্লাস না নিয়ে অনেক শিক্ষক একই সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। এরকম ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে। দলীয় আনুগত্যের কারণে তাদের নিজস্ব মতামত বা বিবেক বলতে এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাই পুলিশ ছাত্রীদের হলে ঢুকে নির্যাতন করলেও শিক্ষকদের ভেতরে তেমন কোনো

কে অধম

প্রক্টর নজরুল ইসলাম

ভিসির বাসার সামনে নির্দেশের অপেক্ষায় অবস্থানরত ছাত্রদল ক্যাডার বাহিনী

প্রভুভক্ত ক্যাডার বাহিনী মধুর ক্যান্টিনের সামনে ঘিরে রেখেছে বিভিন্ন হলের ছাত্রদল নেতাদের ... অন্যদিকে থমকে দাঁড়ানো মানবতায় তাদের ছায়া মাড়াতে যেন লজ্জা পাচ্ছে এই প্রভুভক্ত ককুরটিও

ভিসি আনোয়ারউল্লা চৌধুরী

'৭১-এর পাকসেনা নয়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত পুলিশী হামলার খন্ড চিত্র

জাহাজ থেকে নদীতে পড়ে গেল প্রভু। ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুর। প্রভুকে টেনে তুলে রক্ষা করলো কুকুর। কুকুর কখনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না। প্রভুর নিরাপত্তার দায়িত্ব সে পালন করে যথাযথাভাবে। বাবা-মা তার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। ভিসি-প্রক্টর সন্তানের নিরাপত্তা দেবে – এটা তাদের বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে কী? ভিসি প্রক্টরের নির্দেশেই ছাত্রছাত্রীরা লাঞ্ছিত হলো, হলো রক্তাক্ত।

ভিসি প্রভুভক্ত... প্রভুর অনুচরদের রক্ষায় সে আহত করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের... ছাত্রদলের ক্যাডাররা 'প্রভু' ভিসির নির্দেশে ক্যাম্পাস খালির দায়িত্বে তৎপর আর পুলিশ সব সময়ই প্রভুভক্ত, একই সঙ্গে অশ্লীল নির্যাতনকারী... এই তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্যই নিন্দনীয়... তাহলে সর্বাপেক্ষা অধম কে?

প্রতিক্রিয়া হয়নি। পাঁচশ' শিক্ষকও এক হয়ে বলতে পারেন না যে আমরা পদত্যাগ করবো বিচার না হলে। একত্রিত হতে পারেন মাত্র অল্প কয়েকজন শিক্ষক। প্রথমাবস্থায় অধ্যাপক মেজবাহ কামালরা তিন-চারজন মাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে পেরেছেন। শিক্ষক সমিতির মিটিং ডাকতে সময় লেগে যায় তিন দিন। চার দিন পরে তারা মৌন মিছিল করে। অল্প কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আমরণ অনশন করছেন। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার শেষ নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই মেরুদণ্ডহীন– এমন মন্তব্য করতেও কোনো দ্বিধা নেই। শিক্ষক সমিতির মিটিংয়েই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, 'আমি নিজে শিক্ষক। আমরা কি করছি। ইদানীং লক্ষ্য করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে পুলিশ ইন্সপেক্টর হওয়ার প্রবনতা। বিশেষ করে প্রক্টর সহকারী প্রক্টররা। তারা ছেলে মেয়েরা কোথায় বসে আছে, সেটা দেখবে আর তাদের ধরে কান ধরে উঠবস করাবে। পুলিশের মতই আচরণ। আমার তো মনে হয় ক'দিন পর তারা রমনা থানার ওসি হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামবেন'।

রাজনৈতিক দলগুলোর সমাজের প্রতি কিছু দায়দায়িত্ব আছে। একথা তারা নিজেরাই বলে। দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল অথচ তারা প্রায় নিশ্চুপ, নির্বিকার। শেখ হাসিনা বিদেশে থেকে নেতাদের আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। কিন্তু এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়ামী নেতাদের কোনো কর্মসূচি দিতে দেখা যায়নি। সরকার বা বিএনপির কাছে তো কোনো প্রত্যাশা এক্ষেত্রে নেই। কারণ তারাই নির্যাতন করছে। বিরোধী দলের তো একটা দায়িত্ব আছে। বিরোধী দল এই দায়িত্ব পালন করা কবে শিখবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রক্টর ও ৮ জন সহকারী আছেন। তাদের কাজ কী? সেটা এক রহস্যময় ব্যাপার। তারা রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাসে গাছ কাটতে সহযোগিতা করেন। ছাত্রছাত্রীরা জুটিবদ্ধ হয়ে বসে থাকলে তাদের ধরে আনেন। কান ধরে উঠবস করান। মোটামুটিভাবে এরকম কাজ করতেই প্রক্টরদের দেখা যায়। অকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কাজ করা যায় না। তাই প্রক্টরও ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে পারেন না, দেয়ার চেষ্টাও করেন না। পুরুষ পুলিশকে মেয়েদের হলে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দায় চাপাতে চান সুলতানা শফির কাঁধে। অকর্মণ্য, অযোগ্য মানুষের পক্ষেই কেবল এমন অবস্থান নেয়া সম্ভব।

প্রক্টরকে সদস্য সচিব করে করা তদন্ত কমিটি কী রিপোর্ট দেবে সেটা সবাই জানে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করাটা সরকারের সুমতির পরিচয় বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও পুলিশ এবং ক্যাডার দিয়ে সরকার যেভাবে ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিকদের নির্যাতন করলো তাতে কোনো তদন্ত কমিটির ওপরই আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। সরকার হয়তো পুরো বিষয়টিকে শুরু থেকেই গুরুত্ব দিতে চায়নি। পুলিশ আর ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের দিয়েই পরিস্থিতি সামলে উঠতে পারবে বলে ভেবেছিল। তাই সরকারের শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বিবিসির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'রোকেয়া হলের ঘটনা...।' শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কোন হলে ঘটনা ঘটেছে সেটাও জানার প্রয়োজন মনে করেননি। দায়-দায়িত্ব আর কাকে বলে!

শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশের নির্যাতনের ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কের কালিমা হিসেবে বহন করবে আজীবন। শিক্ষকদের ইতিহাস ক্ষমা করবে না। ছাত্রনেতা, ছাত্ররাজনীতিকে তো নয়ই। আর রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কিছুতেই কিছু যায় আসে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ' ছাত্র মারা গেলে বা একশ' ছাত্রী ধর্ষিত হলেও তাদের কিছু যায় আসতো না। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি যে রাজনীতিবিদদের সামান্যতম দায়বদ্ধতা নেই, তাদের কাছে কোনো কিছুই আশা করা যায় না।

ঢাবি ক্যাম্পাসের এ ঘটনায় এখন নিন্দিত ভিসি, প্রক্টর, পুলিশ আর ছাত্রদল ক্যাডার বাহিনী। ভিসি তার গদি রক্ষার্থে অসংখ্য মিথ্যার প্রসবদানের পাশাপাশি অব্যাহত রেখেছেন পুলিশ ও ছাত্রদলের ক্যাডার বাহিনীকে নির্দেশ দেয়ার কাজ। 'প্রভু'র অনুচর ছাত্রদলের কয়েক নেত্রীকে রক্ষার উদ্যোগ এভাবে নিয়েছিলেন এই 'প্রভু'ভক্ত ভিসি। ভিসির কল্যাণে পুলিশ পেয়েছে ছাত্রী হলে রাতের আন্ধকারে প্রবেশের সুবর্ণ সুযোগ। অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। 'এমন জায়গায় পেটাবো যে কাউকে দেখাতেও পারবি না'-এ কথা বলতে দ্বিধা হয়নি তাদের। কারণ এদের চরিত্র এমনই। একজন ছাত্রী বলেছেন 'সেদিন যে আচরণ পুলিশ আমাদের সঙ্গে করেছে তা আমি বলতে চাই না, আর তা লেখাও অসম্ভব।' পুলিশের এই অশ্লীল চরিত্র আমাদের কাছে নতুন নয়। 'প্রভু'কে খুশি করার পাশাপাশি স্বরূপ সন্ধানের একটু প্রয়াস...। পুলিশের এই অশ্লীল চরিত্রের অংশীদার এখন ভিসি প্রক্টররাও।

আরেক নূর হোসেন আরেক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে!

ছাত্রদলের ক্যাডাররা সে রাতে সুযোগ না পেলেও ক্যাম্পাস খালি করার দায়িত্ব নিয়ে তারা যেন পোষা প্রাণীর মতো আচরণ করেছে। ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিকদের রড, লাঠি দিয়ে পেটাতে পেরে তারা বেশ আনন্দিত। হয়তো এ ঘটনায় তুষ্ট তাদের ভিসি এবং স্বয়ং সরকারও। ছাত্রদলের ক্যাডাররা 'দায়িত্ব' পালনের জন্য দুই দিন আগে থেকেই উন্মুখ হয়ে ছিলো। মধুর ক্যান্টিন, ভিসির বাসভবনের সামনে তাদেরকে জটলা হয়ে থাকতে দেখা গেছে। কি সেই দৃশ্য? 'প্রভু'ভক্ত প্রাণীকুল...

একই সময় আমাদের ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে মধুর ক্যান্টিনের আমতলায় ঘোরাঘুরি করা নেড়ি কুকুরটি। সে এসেছিলো খাদ্যের সন্ধানে। সেও প্রভুভক্ত...

এই চার শ্রেণীর প্রভুভক্তের মধ্যে কে উত্তম? কেইবা অধম? এই প্রশ্ন ভাবিয়েছে আমাদেরকেও। তবে প্রশ্নটি ওঠায় আমরা একটু বিব্রত। কেননা এখানে এসে পড়েছে নিরীহ প্রাণী মধুর ক্যান্টিনের কুকুরটি। সে নিরপরাধ। কাউকে কামড়ে সে জীবিকা নির্বাহ করছে না... অন্য তিনটি শ্রেণী উদ্ধত, নিরীহের ওপর নির্যাতনের জন্য উন্মুক্ত। আর প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ভিসির নিকৃষ্টতা, অশ্লীলতা এখন অবর্ণনীয়ের পর্যায়ে।

আপনিই বলুন কে অধমতম?

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**